Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 22
Website: https://tirj.org.in, Page No. 157 - 165
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 157 - 165
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প : নারীর আত্মমর্যাদার প্রয়াস

সাধন বিশ্বাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : sadhanbiswas506@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Female, Modern Culture, Self-assertion, Chauvinism, Struggles, Protests, Climax, Criticism.

Abstract

One of the most important constituents of the Bengali literature are short stories. The short stories of Rabindranath Tagore has played a significant role in giving a shape to the short stories of Bengali literature and hence he is renowned as a great short story writer. Being a son of Zamindar he had to travel to Bangladesh (East Bengal) to supervise the peasants who worked in their land and at that time he, very closely witnessed the life of the villagers there, which he later described in his short stories. Tagore has composed around 90 short stories and the first one was 'Ghater Kotha'. The book 'Golpoguccha' contains all his short stories which were composed during the year 1891-1929.

On one hand as his stories portray a vivid picture of the scenarios of the Bengali village life, on the other hand he has been seen to put up the issues and woes of the feminine groups faced at that time stressing mostly on the amount of importance given to them and their social rights. He has played a crucial role on liberating women from their social shackles portraying them as free individuals in his stories.

Literary critics have indicated a great transition in the characteristics of women from the era of 'Sadhana Bharati' to 'Sabuj Patra'. Initially, the women were seen to suffer chauvinism but in 'Sabuj Patra' they were observed to establish their existence by means of struggles and protests.

Tagore's most popular feminine characters from the later period were- Mrinal from 'Streer Patra', Giribala from 'Manbhanjan', Kalyani from 'Aparichita', Anila from 'Poila Nombor', Sohini from 'Laboratori', Anondi from 'Bostami', Sattabati from 'Chitrakar' etc. All these female characters are seen to establish their existence in the society created in the respective stories by means of protests and struggles. Even in some circumstances the characters were observed to give up from their marital relation with an uncompromising attitude.

European authors had already started to glorify female characters in their stories at that time and in some way, Tagore's female characters were also influenced by them along with the modern culture that was gradually evolving during that time. Thus, it can be said that the protesting form of

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 22
Website: https://tirj.org.in, Page No. 157 - 165
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

women in Rabindranath Tagore's short stories and their self-assertion is a significant issue which is still very relevant in Bengali literature.

Discussion

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল ছোটগল্প। মানুষ সেই আদিকাল থেকেই গল্প রচনা করে আসছে। তবে ছোটগল্পের আকার ও প্রকার কি হবে সে সম্পর্কে বিভিন্ন সমালোচক বিভিন্ন ধরনের মতামত প্রকাশ করেছেন। বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের পূর্ণতা পায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখনীর মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছোটগল্পের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তাঁর 'বর্ষাযাপন' কবিতায় বলেছেন –

> "ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখ কথা
> নিতান্তই সহজ সরল,
> সহস্র বিস্মৃতিরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি,
> তারি দু'চারটি অশ্রুজল।
> নাহি বর্ণনার ছ'টা ঘটনার ঘনঘটা,
> নাহিতত্ত্ব নাহি উপদেশ
> অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
> শেষ হয়েও হইলো না শেষ।"[১]

পাশ্চাত্য সাহিত্যিক এডগার অ্যালান পো, ছোটগল্প প্রসঙ্গে বলেছেন -

> "A brief prose narrative requiring from half an hour to one or two hours in it purusal."[২]

আবার আধুনিক কালের সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছোটগল্প প্রসঙ্গে বলেছেন, -

> "ছোটগল্প লেখকের মানস প্রতীতি-জাত একটি সংহত গদ্যকাহিনী যার একতম বক্তব্য কোন ঘটনা, চরিত্র, পরিবেশ অবলম্বন করে ঐক্য সংকটের মধ্য দিয়ে সমগ্রতা লাভ করে।"[৩]

অর্থাৎ গল্পের শুরু থেকে কোন অপ্রাসঙ্গিকতা না রেখে গল্পকারকে চমকের মধ্যদিয়ে এগোতে হয় ঘটনা ক্রমের পরিণতিতে বা climax এর দিকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন জমিদারির কাজ দেখাশোনার জন্য পূর্ববঙ্গের শিলাইদহ, সাজাদপুর, কুষ্টিয়া, পতিসর ইত্যাদি অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেন তখন তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন মানুষ তথা গ্রাম বাংলার নানান দৃশ্যকে। আর সেইসব বিষয় বৈচিত্র্যকে তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর কবিতা, গল্প-উপন্যাসে। এই একই সময়ে কবি তার স্ত্রীকে, ভাইজি ইন্দিরা দেবীকে এবং আরো প্রিয়জনদেরকে বহু পত্র লিখেছিলেন, যেগুলি তাঁর 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থে সংকলিত করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম ছোট গল্প হল 'ঘাটের কথা'। যদিও এ বিষয়ে সমালোচক মহলে মতবিরোধ আছে তাই সমালোচক সুখরঞ্জন রায় বলেছিলেন, -

> "ঘাটের কথা' লিরিক ও ছোটগল্পের সীমান্ত দেশের রচনা, ছোটগল্পের স্ফুটগৌরবে অপ্রকাশিত।"[৪]

তাই কেউ কেউ আবার 'ভিখারিনী'কে তাঁর প্রথম ছোটগল্প বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্পের সংখ্যা প্রায় ৯০টি। মোটামুটি ভাবে বলা যায় তাঁর গল্পগুচ্ছের রচনাকালের সময়সীমা ১৮৯১-১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ। তাঁর এই চল্লিশ বছর ব্যাপী লিখিত ছোটগল্পগুলিকে কয়েকটি পর্যায় বিভক্ত করা যায়। ক. হিতবাদী - সাধনার যুগ ওরফে সোনার তরী - চিত্রার যুগ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 22
Website: https://tirj.org.in, Page No. 157 - 165
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

(১৮৯১-১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ/ ১২৯৮-১৩০০ বঙ্গাব্দ)। তখন লেখকের বয়স ৩০ থেকে ৩৩ বছর। গল্পের সংখ্যা ৩৩। এই পর্যায়ের গল্প গল্পগুচ্ছের প্রথম খণ্ডে সংকলিত। খ. সাধনা - ভারতীর যুগ ওরফে সোনারতরী – চিত্রা – চৈতালি – মালিনী - কাহিনীর যুগ (১৮৯৪-১৯০২ খ্রীঃ/ ১৩০১-১৩০৯ বঙ্গাব্দ)। তখন লেখকের বয়স ৩৩ থেকে ৪২ বছর। গল্পের সংখ্যা ৩১। এই পর্যায়ের গল্প গল্পগুচ্ছের দ্বিতীয় খণ্ডে সংকলিত। গ. ভারতী-সবুজপত্রের যুগ ওরফে বলাকা-ফাল্গুনী-পলাতকার যুগ (১৯০৩-১৯৩৩ খ্রীঃ/ ১৩১০-১৩৪০ বঙ্গাব্দ)। তখন লেখকের বয়স ৪২ থেকে ৭২ বছর। গল্পের সংখ্যা ২০। এই পর্যায়ের গল্প গল্পগুচ্ছ তৃতীয় খণ্ডে সংকলিত।[৫]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পে যেমন গ্রাম-বাংলার ছবি তথা নানাবিধ মানুষের কথা উঠে এসেছে তেমনি ভাবে তিনি নারীর মর্যাদা বা নারীর অধিকার পাবার জন্য প্রতিবাদী চিত্রকেও তুলে ধরেছেন। তৎকালীন সময়ে নারীদেরকে যেভাবে সমাজের ঘেরাটোপে আবদ্ধ করে রাখা হত, তাদেরকে সামাজিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা হত, সেই সব দুর্দশা থেকে নারীদেরকে প্রথম মুক্তি দান করলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর গল্পের মাধ্যমে। তিনি সমাজ, শাস্ত্র ও পুরুষের শাসনের বিরুদ্ধে আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম দেখালেন তার সৃষ্ট নারী চরিত্রের মাধ্যমে। আমরা দেখেছি তাঁর 'সাধনা–ভারতী'র (১৮৯৮- ১৯০২) পর্বে গল্পের নারী চরিত্রেরা নীরবে লাঞ্ছনা, অপমান, অত্যাচার সহ্য করেছে, তবে 'ভারতী-সবুজপত্রে'র (১৯০৩-১৯৩৩) পর্বে গল্পের নারীরা এসবের বিরুদ্ধে তাদের সাহসী মনোভাবকে বিদ্রোহী রূপে পরিবর্তন করেছে। এই পর্বের নারীরা মূলত আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে চালিত হয়েছে। এই ধারার সৃষ্ট নারী চরিত্রমূলক গল্পগুলি হল- 'স্ত্রীরপত্র', 'পয়লা নম্বর', 'মানভঞ্জন', 'অপরিচিতা', 'বোষ্টমী', 'ল্যাবরেটরি', 'চিত্রকর' ইত্যাদি। মূলত আধুনিকতার প্রভাবে নারীরা যেন তাদের চেহারাকে খানিকটা পাল্টে নিলেন, তারা প্রতিবাদী হয়েছে নিজেদের মর্যাদার তাগিদে। আর লেখক তাদের প্রতিবাদকে দেখালেন সংসারের বাইরে গিয়ে, তাই প্রত্যেকেই দূরে চলে গিয়েছেন সবকিছু ত্যাগ করে। যদিও পাশ্চাত্য সাহিত্যে তৎকালীন সময়ে নারীর মর্যাদা ও মুক্তির প্রসঙ্গ বেশ প্রচলিত বিষয়। সেই সময় গলসওয়ার্দির 'ফরসাইট সাগা, ইবসেনের 'ডলস হাউস, এবং বার্নাড শ' এর নাটকে নারীর জয় গান শোনা যায়।[৬] লেখকের এই নারীভাবনার পেছনে পাশ্চাত্য সাহিত্যের কিছুটা প্রভাব ছিল। জানা যায় ইউরোপীয় সাহিত্যিক আলফস দোদে এবং ব্রেট হার্ট এই দু-জনের সাহিত্য রচনার সাথে তাঁর যোগাযোগ ছিল। 'য়ুরোপ যাত্রীর' খসড়া অংশে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের ২৩ শে অক্টোবরের দিনলিপিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আলফস দোদের পড়ার কথা লিখেছেন।[৭] অবশ্য পরবর্তীতে ডায়েরির পরিমার্জিত পাঠে জানা যায় সেটি একটি গল্পের বই ছিল।

সবুজপত্র পর্বের অন্যতম 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে প্রথমেই দেখতে পাই নায়িকা মৃণাল তার স্বামীকে একটি চিঠি লিখেছে। সে লিখেছে তার শ্বশুরবাড়ির সংসারে ঠিক কেমন পরিবেশ ছিল এবং তাকে কেউ মান্য করত না। তাই প্রতিটি পদে পদে আমরা তার প্রতিবাদী সত্তাকে দেখতে পাই। গল্পে দেখা যায় এবাড়ির মেজবউ হিসাবে তাকে বিয়ে করে আনা হয়েছিল মূলত তার রূপের সৌন্দর্য ছিল বলেই। অবশ্য এ বাড়ির লোক ভেবেছিল যা বলবে মুখ বুঝে শুনবে কিন্তু তা হয়নি। গল্পকার লিখেছেন -

> "তোমাদের ঘরের বউ এর যতটা বুদ্ধির দরকার বিধাতা অসতর্ক হয়ে আমাকে তার চেয়ে অনেকটা বেশি দিয়ে ফেলেছেন, আমি এখন ফিরিয়ে দিই কাকে।"[৮]

এই গল্পে মৃণালের প্রতিবাদ আরো ব্যাপক আকার ধারণ করে যখন তার বড় জায়ের বোন বিন্দু এ বাড়িতে আসে। তোমরা তাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারোনি, তাই জোর করে এক পাগল ছেলের সাথে গোপনে তার বিয়ে ঠিক করলে। বিন্দু কিছুতেই বিয়ে করবে না, রাজি না থাকা সত্ত্বেও তাকে বিয়ে দিয়ে স্বামীর ঘরে পাঠানো হল এবং সে যখন জানতে পারলো তার স্বামী পাগল পালিয়ে চলে এলো এ বাড়িতে। আমি তাকে আশ্রয় দিলাম তাই মৃণাল প্রতিবাদের সুরে সেদিন বলেছিলেন,

> "এমন ফাকির বিয়ে বিয়েই নয়। বিন্দু, তুই যেমন ছিলি তেমনি আমার কাছে থাক, দেখি তোকে কে নিয়ে যেতে পারে।"[৯]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 22
Website: https://tirj.org.in, Page No. 157 - 165
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পুনরায় তোমরা আবার তাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠালে। জানতে পারলাম তোমার খুড়িমা শ্রীক্ষেত্রে তীর্থ করতে যাচ্ছে, আমিও ঠিক করলাম তার সাথে যাব। আমার ভাই শরৎকে ডেকে বললাম যেমন করে হোক বিন্দুকে পুরি যাবার গাড়িতে তোকে তুলে দিতে হবে। পরদিনই সে খবর দিল বিন্দু কাপড়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। তাই সে জানায়, --

> "কিন্তু আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরব না।"[১০]

মৃণাল মনে করেন পৃথিবীর কোন নিয়মে আছে যে তোমরা কাউকে বন্দী করে রাখতে পারো? এরকম কোন দেয়াল নেই, কোন নিয়ম নেই। তাই মৃণাল দীপ্ত কণ্ঠে লিখেছেন, --

> "তোমাদের গলিকে আর ভয় করি নে। আমার সমুখে আজ নীল সমুদ্র, আমার মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ।"[১১]

তাই আজ যেন এই সংসার থেকে দূরে এসে মুক্ত হয়েছে। বিশেষ করে বিন্দুর মৃত্যু তাকে যেন আরো অন্ধকার থেকে আলোর দিকে অবতরণ করেছে। মৃণাল বলে, 'আমি বাঁচবো, আমি বাঁচলুম।' এভাবেই লেখক দেখিয়েছেন মৃণাল তার নিজের অভিজ্ঞতায় দিয়ে শ্বশুরবাড়ির লাঞ্ছনায় ও পুরুষ-শাসিত সমাজ তাকে যেভাবে অত্যাচার করেছে তা কখনোই নতমস্তকে স্বীকার করেনি বরং তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছে।

লেখকের অন্যতম আরেকটি গল্প হল 'মানভঞ্জন'। এ গল্পের নায়িকা গিরিবালার বিয়ে হয় গোপীনাথের সাথে। গিরিবালা দেখতে খুবই লাবণ্যময়ী, তাই তাকে কোনো দিক থেকে হারানো সম্ভব ছিল না। কিন্তু সে নিজেই যেন সুখী হতে পারছে না কারণ তার স্বামী আগের মত এখন আর তাকে সময় দেয় না, তাকে ভালোবাসে না। তাই তার খারাপ লাগে সে বলে, --

> "স্বামী আছে, কিন্তু স্বামী তাহার আয়ত্তের মধ্যে নেই।"[১২]

অবশ্য সদ্য গোপীনাথের বাবা মৃত্যুতে তাকে সংসারের সমস্ত দায়ভার নিতে হয় এবং পাড়ার কিছু দায়িত্ব তার কাঁধে চলে আসে ফলে সে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আর এদিকে গিরিবালা তার রূপ যৌবন নিয়ে একা একাই থাকতে লাগে তাই তার মন ভেঙে যায়। ঠিক তারপর থেকেই লেখক এই গিরিবালা চরিত্রের মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন নিয়ে আসলেন। এপ্রসঙ্গে সমালোচক সোহাবার হোসেন বলেন, --

> "প্রথম দিকে নায়িকা গিরিবালা স্বামী গোপীনাথের অত্যাচার অবিচার অবহেলা সহ্য করেছে। কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ে এই গিরিবলা প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে।"[১৩]

গিরিবালার একটি দাসী ছিল তার নাম সুধা, তাকে দিয়ে সমস্ত কাজ করাত। বিশেষ করে সে নাচ-গান এবং গিরিবলার রূপচর্চার কাজ খুব ভালোভাবে করত। গিরিবালা জানতে পারে তার স্বামীর সাথে 'লবঙ্গ' নামে একটি মেয়ের সম্পর্ক আছে মেয়েটি থিয়েটারে নাচ-গান করে, আর তাকে দেখে সবাই পাগল হয়ে যায়। একদিন তার স্বামীর মুখে লবঙ্গের কথা শুনলে তার ভীষণ রাগ হয় এবং বলে সে নিজেই থিয়েটারে গিয়ে দেখবে সেখানে কি হয়। স্বামীর বারণ না শুনে সে গিয়ে দেখে 'মানভঞ্জন' অপেরার নাচ-গান চলছে। এসব দৃশ্য দেখে তার খুব ভালো লাগে সে তাই মাঝে মাঝে চলে আসে। একদিন সেও তার স্বামীর জন্য সুন্দরভাবে সেজে বসে থাকে, ভাবে আজ বুঝি তাকে ভালবাসবে। কিন্তু তা হয় না তাই সে রাগে কারোর কথা না শুনে এবাড়ি ছেড়ে চলে যায়। তারপর গিরিবালা তার আত্মমর্যাদা পাবার জন্য সে নিজেও থিয়েটারে যোগ দেয় এবং অভিনয় করে। অবশেষে একদিন স্টেজে গিরিবালার নাচ-গান স্বয়ং তার স্বামী দেখে এবং সে উন্মাদ হয়ে পাগলের মতো চিৎকার করে। লেখকের ভাষায়, --

> "তখন গোপীনাথ সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া, 'গিরিবালা', 'গিরিবালা', করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল।"[১৪]

ঠিক সেই মুহূর্তে পুলিশ এসে রসভঙ্গের দায়ে তাকে বের করে দেয় থিয়েটার থেকে। আর এদিকে যথারীতি থিয়েটারের নাচ-গান চলতে লাগলো। এভাবেই লেখক তার শিল্প সৌরভের মধ্য দিয়ে গিরিবালাকে প্রতিবাদী রূপে সৃষ্টি করেছেন।

'অপরিচিতা' গল্পের নায়িকা কল্যাণীর বিবাহকে কেন্দ্র করে গল্পের প্লট নির্মিত। এই গল্পের প্রতিবাদী স্পৃহাকে লেখক খানিকটা অন্যভাবে দেখিয়েছেন। তখনকার দিনে 'পণপ্রথা' উল্লেখযোগ্য বিষয়, তাকে লেখক দারুণভাবে বর্ণনা করেছেন এইগল্পে। গল্পের নায়ক অনুপম শিক্ষিত ছেলে দেখতেও ভালো তার বাবা ওকালতি করে প্রচুর টাকা পয়সা রেখে মারা গেছেন। তাই তার মামার ওপরে দেখাশুনার দায়-দায়িত্ব পড়েছে। তার মামা ছেলেকে বিয়ে দেওয়ার জন্য পাত্র খোঁজে তবে তাদের শর্ত হল- পাত্রী দেখতে সুন্দর হতে হবে আর পাত্রীর বাবার বিষয় সম্পত্তির পরিমাণ খুব বেশি না থাকলেও তারা যেন দেনা-পাওনা দিতে রাজি হয় এমন টা চান। লেখকের ভাষায়, --

> "তিনি এমন বেহাই চান যাহা টাকা নাই, অথচ যে টাকা দিতে কসুর করিবে না।"[১৫]

এমন সময় তার বন্ধু হরিশ ছুটিতে কলকাতায় আসে এবং বলে একটি দারুণ মেয়ে আছে বিয়ে করবি নাকি। বিষয়টি তার মামাকে গিয়ে বলে এবং মামা যেমন পাত্রী চেয়েছেন ঠিক তেমনটাই পেয়ে যান। কথামতো পাত্রীর বাবা শম্ভুনাথবাবু তাদের বাড়িতে আসেন এবং ছেলেকে দেখে যান। এদিক থেকে বিনুদাদা পাত্রীকে দেখতে যান এবং এসে বলেন পাত্রী অপূর্ব সুন্দর দেখতে। সুতরাং বিয়ে ঠিক হয়ে যায় এবং দেনা-পাওনা হিসাবে যতটুকু যা সোনা-গয়না, টাকা-পয়সা দেবার কথা সেসবও ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু সমস্যা হয় বিয়ে শুরু হওয়ার মুহূর্তে, তার মামা শম্ভুনাথবাবুকে পাশে ডেকে বলেন তিনি সমস্ত গহনা সঠিক কিনা দেখে নেবেন। যেটা শম্ভুনাথবাবুর কাছে খুব খারাপ লাগে এবং তিনি যথারীতি সমস্ত গহনা পাত্রীর গা থেকে খুলে দেখিয়ে দেন। তারপর তাদেরকে খাওয়া-দাওয়া করে বিদায় নেবার কথা বলেন। যেটা দেখে তার মামা হতবাক হয়ে যান এবং অপমানপূর্বক তারা ফিরে যান। শম্ভুনাথবাবু বলেন, --

> "আমার কন্যার গহনা আমি চুরি করিব একথা যারা মনে করে তাদের হাতে আমি কন্যা দিতে পারি না।"[১৬]

ঠিক সেই মুহূর্তে কল্যাণী এইসব দৃশ্য দেখে রেগে যান। ঘটনাচক্রে বেশ কিছুদিন পর অনুপম তার মাকে নিয়ে ট্রেনে চেপে তীর্থযাত্রায় যান, ঠিক সেই মুহূর্তে একটি মেয়ে ওঠেন এবং পাশেই বসেন। খানিক পরে কথা বলে জানতে পারে মেয়েটি নাম কল্যাণী, তার বাবাই হলেন শম্ভুনাথ। তারা অবাক হয়ে যান এবং অনুপম ঠিকানা নিয়ে কানপুরে চলে আসেন। তার বাবাকে বিবাহের জন্য রাজি করলেও কল্যাণী কিছুতেই রাজি হয় না। সে বলেন, --

> "আমি বিবাহ করিব না, কারণ মাতৃ আজ্ঞা।"[১৭]

জানা যায় তার বিয়ে ভাঙার পরদিন থেকে কল্যাণী সমগ্র মেয়েদের শিক্ষার ব্রত গ্রহন করেছে, তাই নিজে বিয়ে করেনি। এখান থেকেই বোঝা যায় কল্যাণী চরিত্রের মধ্যে প্রতিবাদী সত্তা জেগে উঠেছে এবং যে মর্যাদা পেয়েছে তা যেন সমগ্র নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠা।

নারীর বেদনা ও সেখান থেকে বিদ্রোহী হয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার অন্যতম ফসল হল 'পয়লানম্বর' গল্পটি। এই পাড়ার গলির দু'নম্বর বাড়ির বাসিন্দা অদ্বৈতচরণ যিনি অনিলার স্বামী। তার স্বামী শিক্ষিত, বিদ্যা-বুদ্ধি যথেষ্ট আছে কিন্তু সে তার স্ত্রী অনীলাকে তার স্বাধীনতা থেকে খর্ব করে। তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাই নিজের শাসনের মধ্য দিয়ে। তবে শেষ পর্যন্ত তার স্বামী তা করতে পারেনি কারণ সেখান থেকে অনিলা বিরোধ করে অনেক দূরে চলে যায়। অনিলার যে নিজস্ব একটি জীবন আছে, সুখ-দুঃখের যে একটি বৃত্ত আছে, তা কখনোই তার স্বামী জানতে চাইনি। বরং তার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও একদিন তাদের বাড়িতে আলোচনা সভা বসলে, তাদের প্রত্যেকের জন্য মাছের কচুরি আর বিলাতি আমরা চাটনি করে আনতে বলে তার স্বামী অদ্বৈতচরণ। সে স্বামীর কাছে নারীর মর্যাদা কখনোই পায়নি। আসলে অদ্বৈতচরণ অনিলাকে দেখেছে আংশিকভাবে সংসারের প্রয়োজনে তারা শুধু ব্যবহার করেছে তাদের কাজের তাগিদে। ঠিক তার কিছুদিন পর তাদের পাড়ার গলির এক নম্বর বাড়িতে সিতাংশু মৌলি নামে এক জমিদার বসবাস করতে শুরু করেন। লেখকের বর্ণনায়,

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 22
Website: https://tirj.org.in, Page No. 157 - 165
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "ইতিমধ্যেই আমাদের গলির পয়লা নম্বর বাড়িতে লোক এল।"[১৮]

এই ব্যক্তিটি জমিদার তার মধ্যে অনেক গুনাগুন ছিল, লোকটি শিক্ষিত ছিলেন তবুও তার ব্যবহারেও অনিলার আত্মমর্যাদা ক্ষুন্ন হয়েছে। সেটা মূলত তার ভাই সরজের আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করেই। এই মৃত্যুতে অনিলা কতটা কষ্ট পেয়েছে তা বলতে চাইনি, অথচ তার স্বামী জানতে পারিনি তাই তার অভিমান হয়। অপরদিকে সুতাংশু মৌলীর অবহেলিত লুব্ধ দৃষ্টিপাতে অনিলের নারীত্বকে অবমাননা করেছে। এইসবকে অনিলা মেনে নিতে পারেনি তাই পরদিনই গৃহ ত্যাগ করে। যাবার আগে সে একটি নীল কাগজের টুকরোয় চিঠি লিখে যান -

> "আমি চললুম। আমাকে খুঁজতে চেষ্টা করো না। করলেও খুঁজে পাবে না।"[১৯]

এই চিঠির অর্ধেক অংশ তার স্বামীকে এবং বাকি অর্ধেক অংশ সিতাংশু মৌলিকে দিয়ে যান। এই দুই ব্যক্তির অবমাননার জগৎ থেকে উদ্ধারের আশায় দু-জনকে একই বাণীর দ্বারা তিরস্কৃত করেছে অনিলা। তাই গল্পের শেষাংশে নারীর মর্যাদার স্বরূপটি প্রকাশিত হয়েছে এবং অনিলা প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে এই পুরুষ শাসিত সমাজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তিনসঙ্গী'র অন্তর্গত অন্যতম ছোটগল্প হল 'ল্যাবরেটরি'। মূলত আধুনিকতার ছোঁয়াতে গল্পটি লেখা। গল্পের প্রথম দিকেই দেখা যায় নন্দকিশোরের মৃত্যুর পর তার বহুকালের গবেষণার ফসল ল্যাবরেটরির দায়িত্ব নেন তার স্ত্রী সোহিনী। এই দায়িত্ব রক্ষার জন্য তাকে বিভিন্নভাবে লড়াই করতে হয়েছে, এমনকি তার নিজের মেয়ে নীলার সাথে তাকে দ্বন্দ্বে জড়াতে হয়েছে। তবে শেষপর্যন্ত সোহিনী ল্যাবরেটরিকে রক্ষা করতে পেরেছে তার সাহসিকতায়। এ প্রসঙ্গে সমালোচক তপোব্রত ঘোষ বলেছেন, --

> "সোহিনী নন্দকিশোরের অনুব্রতা। অর্থাৎ নন্দকিশোরের ব্রতই সোহিনীর ব্রত।"[২০]

সোহিনীর তার মেয়েকে বিশ্বাস করত না তাই ল্যাবরেটরির দায়িত্ব তাকে কখনোই দেয়নি। তাই সে তার বন্ধু অধ্যাপকবাবুকে বলেন যদি কোন ভালো ছেলে পাওয়া যায় তাকে দায়িত্বভার দেবেন। সোহিনীর কণ্ঠে শোনা যায়, --

> "জানেন বোধ হয়, জীবনে আমার স্বামীর ল্যাবরেটরী ছিল একমাত্র আনন্দ। আমার ছেলে নেই, ওই ল্যাবরেটরীতে বসিয়ে দেবো বলে ছেলে খুঁজছি। কানে এসেছে রেবতি ভট্টাচার্যের কথা।"[২১]

সোহিনী ঠিক করলেন প্রয়োজনে তার মেয়ের সাথে বিয়ে দেবেন এবং সাথে তাকে ল্যাবরেটরির দায়-দায়িত্ব দেবেন। এদিকে নীলা চাই ল্যাবরেটরিকে বিক্রি করে দিতে, তাই সে কৌশলে রেবতিকে একদিন রেস্তরাতে আনেন পার্টির উদ্দেশ্যে এবং সেদিন তাকে জাগানি ক্লাবের সেক্রেটারির পদে যোগদান করান। ঠিক সেই মুহূর্তে সোহিনী চলে আসায় সমস্ত পরিকল্পনা ব্যার্থ হয় এবং এসব কান্ড দেখে তিনি খুব রেগে যান। তখনই নীলা বলে এটা আমার বাবার ল্যাবরেটরী। উত্তরে সোহিনী তাকে প্রতিবাদ করে বলে, --

> "কে তোর বাপ, কার সম্পত্তির শেয়ার চাস? এমন লোকের তুই মেয়ে একথা মুখে আনতে তোর লজ্জা করে না?"[২২]

মায়ের এই অগ্নিমূর্তি দেখে সবাই তাকিয়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত সোহিনী প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে তার নিজস্ব মর্যাদাকে রক্ষা করে এবং নারীর অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করে।

সবুজপত্র পর্বের ছোটগল্পে বংশ বনাম ব্যক্তির লড়াই ও নারীর আত্ম-প্রতিস্ঠার সংগ্রাম নানাভাবে দেখা গিয়েছিল। এই দ্বন্দ্বেরই এক বিশেষ প্লট দেখি 'বোষ্টমী' গল্পটিতে। বোষ্টমী গল্পের সূচনায় দেখা যায় কলকাতা থেকে দূরে গল্পকথক অবস্থান করেন। তিনি ভোগী নন, যোগী নন, পথিক নন এমনকি গৃহীও নন। লেখক বলেন, --

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 22
Website: https://tirj.org.in, Page No. 157 - 165
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "অল্প দিন হল খবর পেয়েছেন এই গ্রামে একজন মানুষ আছে যে তার সম্বন্ধে কিছু একটা ভেবেছে। তিনি দেখলেন একটি পৌঢ়া স্ত্রীলোক তাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল। তার আঁচলে কতকগুলি ঠোঙ্গার মধ্যে করবি, গন্ধরাজ এবং আরো দুই চার রকমের ফুল ছিল, তারই মধ্যে একটি লেখকের হাতে দিয়ে ভক্তির সঙ্গে জোড় হাতে সে বলল আমার ঠাকুরকে দিলাম।"[২৩]

ইনি হলেন আনন্দী বোষ্টমী। 'বোষ্টমী' গল্পে আনন্দীর বোষ্টমী হয়ে ওঠা ছিল বোষ্টমীর স্বাধীন নিভৃত প্রতিবাদী সত্তা। বোষ্টমী তার নিজ পরিচয়ে গল্পকথকে জানিয়েছে, --

> "বিবাহ করিয়া এসংসারে যখন আসিয়াছি তখন গুরুঠাকুরকে দেখি নাই। তিনি তখন কাশিতে অধ্যায়ন করিতে গিয়াছেন। আমার স্বামী তাহাকে সেখানকার খরচ যোগাইতেন। গুরুঠাকুর যখন দেশে ফিরলেন তখন আমার বয়স বোধ করি আঠারো হইবে। পনেরো বছর বয়সে আমার একটি ছেলে হইয়াছিল। বয়স কাঁচা ছিল বলিয়াই আমার সেই ছেলেটিকে আমি যত্ন করিতে শিখি নাই। পাড়ার সই সঙ্গতিদের সঙ্গে মিলিবার জন্যই আমার মন ছুটিতো। ছেলের জন্য ঘরে বাধা থাকিতে হয় বলিয়া এক একসময় তাহার উপরে আমার রাগ হইতো।"[২৪]

অপরদিকে গুরুর প্রতি স্বামীর অজস্র ভক্তি তাদের সংসারকে সর্বত্র মৌচাকের ভেতরকার মধুর মতো ভরে রেখেছিল। তাহার বিহার, ধনমন সমস্তই এই ভক্তিতে ঠাসা ছিল, কোথাও ফাঁক ছিল না। তাই দেবতাকে সে গুরুর রূপেই দেখতে পেত। তিনি এসে আহার করবেন এবং তারপর তার প্রসাদ পায়, প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই এই কথাটি তার মনে পড়তো। কিন্তু বোষ্টমীর এই ভাবাবেগে আঘাত আসে সেদিন, যেদিন বোষ্টমী ফাল্গুনের সকালবেলায় ঘাটে যাবার ছায়াপথে স্নান সেরে ভিজে কাপড়ে ঘরে ফেরার পথে সে দেখল পথের একটি বাঁকে আমতলায় গুরু ঠাকুর গামছা নিয়ে কোন একটা সংস্কৃত মন্ত্র আবৃত্তি করতে করতে স্নানে যাচ্ছেন। ভিজে কাপড়ে থাকায় সে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে উদ্যত হতেই তিনি তার নাম ধরে ডাকলেন এবং বললেন, 'তোমার দেহখানি সুন্দর।' মুহূর্তেই অসুন্দরের নগ্নপ্রকাশে আনন্দী এক নতুনতর উপলব্ধিতে জাগ্রত হল। সে ভয় পেল কারণ গুরুদেব যে সেবার বদলে সেবিকাকেই কামনা করছেন তাই বোষ্টমীর মোহভঙ্গ হয়। তাই সে নিজের কাছ থেকেই পালাতে চাইল কিন্তু সবার আগেই তার এতদিনের আশ্রয় তার সত্যকার ভালবাসা স্বামীর কাছ থেকে আপন হৃদয়কে উন্মোচিত করলো। গভীর রাতে মিলল তার মানস আশ্রয়। বিস্মিত স্বামীর কাছে বোষ্টমী জানিয়েছে তার গৃহত্যাগের কথা। কিন্তু তার স্বামী না বুঝলেও আমরা বুঝেছি বোষ্টমীর গৃহত্যাগের কারণ। গুরুর লালসার হাত থেকে মুক্তি পেতেই বোষ্টমীর গৃহত্যাগ অনিবার্য ছিল। এই গল্পে বোষ্টমীর প্রতিবাদ অবুঝ স্বামীর বিরুদ্ধেই। বোষ্টমী গুরুর নামে দোষারোপ করতে চাইলেও স্বামী সেই অভিযোগ মানতো না, মনে করেই বোষ্টমীর মুক্তি লাভের সিদ্ধান্ত। কারণ সে সব সইতে পারে, মিথ্যা সইতে পারে না। বোষ্টমী নিজের আত্মমর্যাদাকে রক্ষা করেছে তাই শেষপর্যন্ত নিজেকে কখনোই গুরুপ্রসাদী হতে দেয়নি।

একজন শিল্পীসত্তার সম্মানকে সঠিক ভাবে মর্যাদা দিতে পারে একজন শিল্পী, তারই ব্যাখ্যা এই 'চিত্রকর' গল্প। এই গল্পে দেখা যায় সত্যবতী তার ইচ্ছাশক্তিকে প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত স্থাপিত করেন। সত্যবতীর স্বামী মুকুন্দ মারা যাবার সময় ওকালতি করে টাকা পয়সা খুব বেশি করতে পারেননি বরং ঋণে জর্জরিত হয়েছে। তাই সত্যবতীকে তার চার বছরের ছেলে চুনিলালকে নিয়ে গোবিন্দলালের কাছে বাধ্যতামূলক আশ্রয় নিতে হয়েছে। মুকুন্দের ভাই গোবিন্দলাল মূলত সংকীর্ণ মনের মানুষ, তার কাছে ধন-সম্পত্তি, টাকা-পয়সা হল শেষ কথা। তিনি অযথা কোন খরচ কখনোই করবেন না বা কারোর ইচ্ছাকে তিনি প্রাধান্য দেন না। তবে সেদিক থেকে মুকুন্দ কিছুটা হলেও ভালো ছিল সে তার স্ত্রীর জন্য অনেক কিছুই করতেন। সত্যবতী আর্টের প্রতি একনিষ্ঠ ছিল এবং সে ভালো ছবি আঁকতে পারতো। তাই সে কখনো সত্যবতীর অজ্ঞাতসারে আদালত থেকে ফেরার পথে কিছু রং, রঙের পেন্সিল, কিছু রঙিন রেশম ইত্যাদি জিনিস কিনে এনে শোবার ঘরে সাজিয়ে রাখত। মুকুন্দের কণ্ঠে শোনা যায়, --

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 22
Website: https://tirj.org.in, Page No. 157 - 165
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "কোনদিন বা সত্যবতীর আঁকা একটা ছবি তুলে নিয়ে বলতেন 'বা, এতো বড় সুন্দর হয়েছে।"[২৫]

তবে এখন তার এই শিল্পীসত্তাকে সত্যবতী তার ছেলের মধ্য দিয়ে দেখাতে চান। তবে গোবিন্দলাল চান না কখনোই সত্যবতীর ইচ্ছা পূর্ণ হোক তাই তিনি চুনিলালের আর্ট শেখা বন্ধ করে দিতে বলেন। কিন্তু সত্যবতী তা মানতে চান না তাই মাঝে মাঝে যখন গোবিন্দলাল বাইরে কোথাও কাজে যান সেই সময়গুলোতে চুনিলালকে আর্ট শেখান। ঘটনাচক্রে সত্যবতীর ভাগ্নে রঙ্গলালের সাথে পরিচয় হন তিনি নামজাদা চিত্রকর ফলে তার কাছ থেকেও সাহায্য পায়। এই গল্পের শেষাংশে সত্যবতীর প্রতিবাদী সত্তা আরো যেন ব্যাপক আকার ধারণ করে। চুনিলাল লুকিয়ে লুকিয়ে আর্ট শিখতেন কিন্তু হঠাৎ একদিন দরজা না বন্ধ করেই সে আর্ট করছিল এবং সেদিন ধরা পড়ে যায় গোবিন্দলালের কাছে। সেদিন গোবিন্দলাল তাকে প্রহার করে এবং বলে এসব করে কোন কিছু হবে না, তারপর তার আর্টের খাতা ছিড়ে টুকুরো টুকরো করে ফেলে। চুনিলাল তখন কান্না করতে শুরু করে এবং তার মা ঠাকুরঘর থেকেই সেই কান্নার শব্দ শুনতে পেলে রেগে ব্যাপক আকার ধারণ করে। সত্যবতী এতদিন সব কিছু সহ্য করেছে কিন্তু আজকে সে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করে গোবিন্দলালকে বলেছে, --

> "কেন তুমি চুনির ছবি ছিঁড়ে ফেললে। গোবিন্দ বললেন, পড়াশুনো করবে না? আখেরে ওর হবে কী? সত্যবতী বললেন, 'আখেরে ও যদি পথের ভিক্ষুক হয় সেও ভালো। কিন্তু, কোনোদিন তোমার মতো যেন না হয়। ভগবান ওকে যে সম্পদ দিয়েছেন তারই গৌরব যেন তোমার পয়সার গর্বের চেয়ে বেশি হয়, এই ওর প্রতি আমার, মায়ের আশীর্বাদ।"[২৬]

ঠিক সেই মুহূর্তে তার ছেলেকে নিয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন রঙ্গলালের কাছে এবং বললেন, 'বাবা, তুমি নাও এর ভার'। শেষ পর্যন্ত সত্যবতী তার ছেলের ভবিষ্যৎ রক্ষায় একজন চিত্রকরের হাতেই তার দায়িত্ব অর্পণ করলেন। সত্যবতী তার শিল্পীসত্তাকে ও ইচ্ছাকে কখনোই পরাজিত হতে দেয়নি বরং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে নিজের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের নিরিখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমকক্ষের দাবিদার কেউ নন। তিনি এই ধারার গল্পে যেন এক নতুন আঙ্গিক নিয়ে এলেন তাই নারীর আবেগকে খানিকটা বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং তাদেরকে সর্বদা জয়ী করে রেখেছেন। আমরা তাঁর 'স্ত্রীরপত্রে' গল্পে দেখেছি নায়িকা- মৃণাল তার অধিকারকে ফিরে পাওয়ার জন্য সংসার ত্যাগ করেছে এবং নারীর মর্যাদাকে প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আবার 'মানভঞ্জন' গল্পে দেখেছি নায়িকা- গিরিবালা তার স্বামীর কাছ থেকে শুধু বঞ্চনা, লাঞ্ছনা পেয়েছে সে কখনোই তার সম্মানটুকু পায়নি। তাই প্রতিবাদী হয়ে শেষ পর্যন্ত নিজে থিয়েটারে অভিনয় করেছে তার অধিকার ফিরে পাবার জন্য। তাঁর 'অপরিচিতা' গল্পে নায়িকা কল্যাণীর বিবাহ উপলক্ষে পণপ্রথাকে বিরোধিতা করেছে এবং সে আর বিয়ে পর্যন্ত করেনি। 'পয়লা নম্বর' গল্পে নায়িকা- অনিলা তার স্বামীর কাছ থেকে নারীর মর্যাদা পাইনি তাই সে এই পুরুষতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়েছে এবং সংসার ছেড়ে বহুদূরে চলে গেছে। তাঁর 'ল্যাবরেটরি' গল্পটিতে দেখা যায়- নায়িকা সোহিনী তার স্বামীর ল্যাবরেটরিকে রক্ষা করার জন্য নিজে লড়াই করেছে এবং সে তার সাহসিকতার মধ্য দিয়ে আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছে। 'বোষ্টমী' গল্পে নায়িকা- আনন্দী বোষ্টমী কোনভাবেই তার গুরু ঠাকুরের কাছে নিজের সম্মানকে বিলিয়ে দেননি বরং সে প্রতিবাদ করেছে তার বিরুদ্ধে। তাঁর 'চিত্রকর' গল্পে নায়িকা- সত্যবতী তার নিজের শিল্পীসত্তাকে তার ছেলের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছে সমগ্র পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গিয়ে। তাই উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনার পরিশেষে বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিষয় ভাবনা ও তাঁর লেখনীর স্বতন্ত্রতা আজও উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বল করছে। তৎকালীন সময়ে দাঁড়িয়ে পুরুষশাসিত সমাজের বিরুদ্ধে নারীর বিদ্রোহ, প্রতিবাদী সত্তা ও নারীর মর্যাদা এই সব বিষয়কে তাঁর গল্পে তুলে ধরার সাহস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়া আর কেউ দেখাতে পারেনি। তবে একথা বলতে হয় যে সেই সময় থেকে আজকের বর্তমান সমাজ শতগুনে উন্নত এবং আধুনিকতায় মোড়া; তবু কি নারীরা আজও স্বাধীন হতে পেরেছে? নারীর ক্ষমতায়ন কি হয়েছে? এইসব প্রশ্ন বর্তমানে

খুবই প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। লেখকের সেই সময়ের ভাবনা আর আজকের সমাজ যেন, কোথাও মিলে মিশে এক হয়ে গিয়েছে সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান এবং তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য আজও যেন জীবন্ত হয়ে রয়েছে তা বলা যায়।

Reference:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সোনার তরী, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, প্রথম প্রকাশ ১৩০০ বঙ্গাব্দ, পুনর্মুদ্রণ শ্রাবণ ১৮৯৯ সন, কলকাতা, পৃ. ৩৯
২. মন্ডল, সুধাংশুশেখর, সাহিত্যের রূপভেদ রূপরীতি নির্ণয়, প্রজ্ঞা বিকাশ, ২০০৫ সন, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ. ৭৯
৩. চট্টোপাধ্যায়, হীরেন, সাহিত্য প্রকরণ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, বৈশাখ ১৪০২ বঙ্গাব্দ, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ. ২৫৯
৪. রায়, সুখরঞ্জন, রবীন্দ্র কথা-কাব্যের শিল্প- সূত্র, মিত্র ও ঘোষ, ফাল্গুন ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ. ২০৩
৫. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, কালের পুত্তলিকা, দেজ পাবলিশিং, আগস্ট ১৯৯২ সন, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ. ২৪
৬. হোসেন, সোহাবার, বাংলা ছোট গল্প তত্ত্ব ও গতি প্রকৃতি (১ম খন্ড), করুনা প্রকাশনী, সেপ্টেম্বর, ২০০৯ সন, কলকাতা- ৭০০০০৯, পৃ. ১০১
৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারী, রবীন্দ্র রচনাবলী (দশম খন্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, পৃ. ৪৫৭
৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, স্ত্রীর পত্র, গল্পগুচ্ছ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, পৃ. ৫৬৮
৯. ঐ, পৃ. ৫৭৩
১০. ঐ, পৃ. ৫৭৫
১১. ঐ, পৃ. ৫৭৬
১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, মানভঞ্জন, গল্পগুচ্ছ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, পৃ. ২৪৮
১৩. হোসেন, সোহাবার, বাংলা ছোটগল্প তত্ত্ব ও গতি-প্রকৃতি (১ম খন্ড), করুনা প্রকাশনী, সেপ্টেম্বর, ২০০৯ সন, কলকাতা- ৭০০০০৯, পৃ. ১০৩
১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, মানভঞ্জন, গল্পগুচ্ছ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, পৃ. ২৫৩
১৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, অপরিচিতা, গল্পগুচ্ছ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, পৃ. ৫৯৯
১৬. ঐ, পৃ. ৬০৩
১৭. ঐ, পৃ. ৬০৮
১৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, পয়লা নম্বর, গল্পগুচ্ছ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, পৃ. ৬২০
১৯. ঐ, পৃ. ৬২৪
২০. ঘোষ, তপোব্রত, রবীন্দ্র-ছোটগল্পের শিল্পরূপ, দেশ পাবলিশিং, বৈশাখ ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ. ৩৭৭
২১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ল্যাবরেটরী, গল্পগুচ্ছ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, পৃ. ৬৯৮
২২. ঐ, পৃ. ৭২২
২৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, বোষ্টমী, গল্পগুচ্ছ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, পৃ. ৫৫৮
২৪. ঐ, পৃ. ৫৬৩
২৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চিত্রকর, গল্পগুচ্ছ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, পৃ. ৬৫৫
২৬. ঐ, পৃ. ৬৫৬ - ৬৫৭